



মাটি থেকে
উঠে আসা ঋষি

অধ্যাপক শিব শঙ্কর ত্রিবেদীর যাত্রা



এটি কোনো সাধারণ বিজ্ঞানীর গল্প নয়।

এটি একজন অনুসন্ধিৎসুর যাত্রা—এমন একজন, যিনি কোনো সীমাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে সেটির ঊর্ধ্বে তাকাতে বেছে নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক শিব শঙ্কর ত্রিবেদী ছিলেন সেই বিরল মনন

অধিকারী, যাঁরা জ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁর কাছে জ্ঞানার্জন কেবল বইয়ের পাতা বা শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং তা ছিল প্রকৃতির গভীর ছন্দের মাঝেই আবিষ্কার করার মতো এক বিষয়।

তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি অবিচল প্রশ্ন:

জীবন ও মানবদেহকে বোঝার কি এমন কোনো উপায় আছে, যা একে দমন না করে, বরং ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে?

গ্রামের সরল মাটি থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার অঙ্গন পর্যন্ত তাঁর এই যাত্রা এক অটল বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে—যে জীবন এক অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত, যা বোঝার অপেক্ষায় রয়েছে।

এটি এমন এক মনের গল্প, যা প্রশ্ন করা কখনো থামায়নি, সংগ্রামের সময়েও নিজের নীতিতে অটল থেকেছে, এবং অবশেষে স্বাস্থ্যকে বোঝার এক নতুন পথের জন্ম দিয়েছে—যা অগণিত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে।





যে মাটি থেকে শুরু

অধ্যাপক ত্রিবেদী উত্তরপ্রদেশের বল্লিয়া জেলার দ্বিজানপুর নামক এক ছোট গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের শিক্ষা বই থেকে আসেনি, বরং এসেছিল মাঠ থেকে—যেখানে মাটি, গাছ আর ঋতুরাশি নীরবে জীবন সম্পর্কে তাঁর বোধকে গড়ে তুলেছিল।

শৈশবে তিনি একবার তাঁর বাবাকে একটি সহজ প্রশ্ন করেছিলেন:

“এই মাটিতে এমন কী আছে যা জীবন সৃষ্টি করে?”

তাঁর বাবার উত্তরটিও ছিল ঠিক ততটাই সহজ, অথচ গভীর:

“জীবন বাইরে থেকে আসে না—এর বিকাশ ঘটে ভেতর থেকে।”

সেই ভাবনাটা তার মনে গেঁথে গেল।

সময়ের সাথে সাথে, তিনি প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন কীভাবে শুকনো ডালপালা থেকে আবার পাতা গজায়, এবং কীভাবে প্রাণহীন মনে হওয়া বীজগুলো সঠিক পরিবেশে সজীব হয়ে ওঠে।

এই নীরব পর্যবেক্ষণগুলো থেকে এক গভীরতর উপলব্ধি জেগে উঠতে শুরু করল:

প্রকৃতি নিরাময় চাপিয়ে দেয় না—বরং তা নিজেকেই পুনরুদ্ধার করে।

এই উপলব্ধিই তার চিন্তার ভিত্তি হয়ে উঠল—যে প্রকৃত নিরাময় বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তা ভেতর থেকেই জাগ্রত হয়।





শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষা

তঁার শিক্ষাজীবন অবশেষে তঁাকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে, যেখানে বিজ্ঞান তঁার কৌতূহলকে শাণিত করেছিল এবং সাহিত্য তঁার উপলব্ধিকে গভীর করেছিল।

বিজ্ঞান অধ্যয়নের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তঁার প্রবল ঝোঁক গড়ে ওঠে। মিল্টন, শেক্সপিয়ার, কীটস এবং হার্ডির মতো লেখকেরা তঁার জ্ঞানযাত্রার সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

তাদের মাধ্যমে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করলেন:

জ্ঞান শুধু গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ নয়।

এটি ভাষায়, সংস্কৃতিতে এবং মানব অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম স্তরেও বাস করে।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই সংমিশ্রণ তঁাকে সমস্যার উর্ধ্বে দেখতে এবং পরিবর্তে জীবনের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলোর উপর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছিল।





যে ঘটনাটি সবকিছু বদলে দিয়েছিল

জ্ঞানের জন্য তাঁর অনুসন্ধান অবিচলিতভাবেই এগিয়ে চলছিল—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত।

একটি আকস্মিক ব্যক্তিগত বিপর্যয় তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে দেয়।

তাঁর ছোট ভাই, দয়াশঙ্কর, যিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারি যত্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও, অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বোঝা বা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান।

এই ক্ষতি কেবল শোকই রেখে যায়নি, বরং এমন একটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল যা কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছিল না:

চিকিৎসাশাস্ত্র যদি এতদূর উন্নত হয়ে থাকে, তবে কেন এটি এখনও জীবনের মূল মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়?

এই প্রশ্নটি ক্রোধে পরিণত হয়নি।

এটি একটি শান্ত, দৃঢ় অনুসন্ধানের পরিণত হয়েছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন:

শরীরকে দুর্বল করে দেওয়াই কি তাকে সুস্থ করার সঠিক উপায়?





জীবনকে বোঝার এক নতুন পথ

বহু বছরের পর্যবেক্ষণ ও মননের পর এবং তাঁর বড় ভাই ডঃ উমাশঙ্কর তিওয়ারীর সাথে আলোচনার ফলে, অধ্যাপক ত্রিবেদী একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে শুরু করেন।

তিনি মানবদেহকে কেবল ভৌত পদার্থের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং এক গভীরতর বুদ্ধিমত্তার সাথে সংযুক্ত একটি গতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে দেখতেন।

তিনি “সচেতন রসায়ন” (Conscious Chemistry) ধারণাটি প্রবর্তন করেন—এমন একটি ধারণা যেখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো এলোমেলো বিক্রিয়া নয়, বরং পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

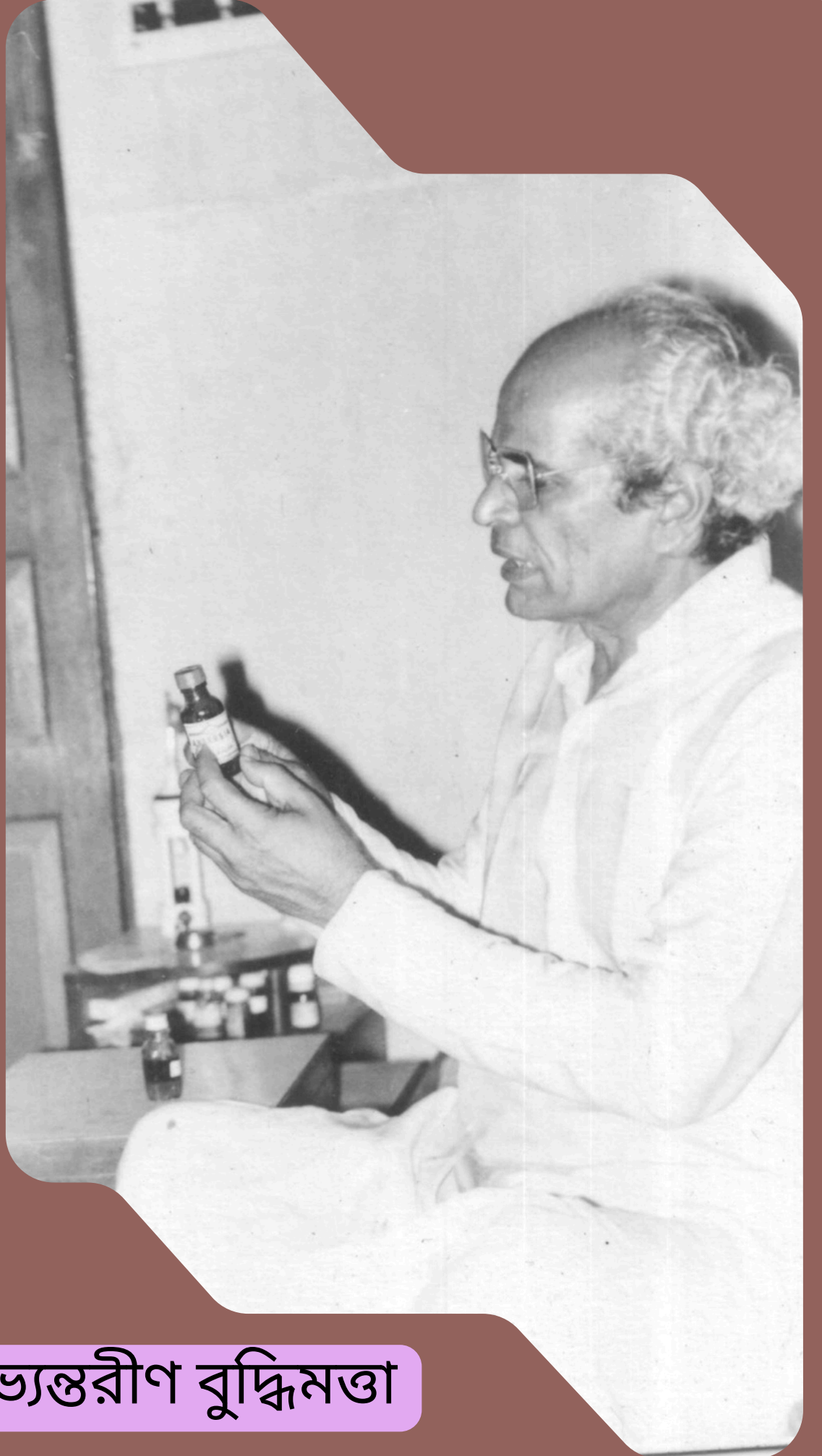


তাঁর মতে, জীবন মৌলিক একক দিয়ে গঠিত, যেগুলোকে তিনি “শস্য” বা ‘অন্ন’ বলে উল্লেখ করেছেন—শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, বরং শক্তি বহনকারী ও কার্য সম্পাদনকারী অপরিহার্য গাঠনিক উপাদান হিসেবে।

তাঁর উপসংহারটি ছিল সহজ, কিন্তু শক্তিশালী:

জীবন কেবল অস্তিত্বশীল নয়—এটি একটি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নিয়ে পরিচালিত হয়।





বিপাক: অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তা

টাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি মৌলিক নীতি—
বিপাক।

তিনি বিপাককে শুধু একটি জৈবিক ক্রিয়া হিসেবে নয়,
বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তা হিসেবে দেখতেন।

এটি নির্ধারণ করে শরীর কী গ্রহণ করবে, কী
রূপান্তরিত করবে এবং কী বর্জন করবে। এটি শক্তি
এবং ভারসাম্যহীনতা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি একবার এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন:

“আমরা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই, কিন্তু শরীরকে বুঝতে
পারছি না।”

এবং তারপর তিনি এই পদ্ধতির নতুন সংজ্ঞা দেন:

“শরীরকে এতটাই সক্ষম করে তুলুন... যাতে তাকে আর
লড়াই করতে না হয়।”

এটিই পরবর্তীকালে পুষ্টি শক্তি বিজ্ঞানে (Nutrient
Energy Science) রূপান্তরিত হওয়ার ভিত্তি হয়ে ওঠে
—এমন একটি ব্যবস্থা যা রোগ ধ্বংস করার উপর নয়,
বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী
করার উপর মনোযোগ দেয়, যাতে শরীর নিজেকে
পুনরুদ্ধার করতে পারে।



সময়ের সাথে সাথে, তাঁর কাজ চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়।

তিনি জীবনকে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন, এই উপলব্ধি করে যে কেবল বস্তু মধ্য সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তিনি জীবনকে তিনটি আন্তঃসংযুক্ত স্তরে বর্ণনা করেছেন—বস্তু, প্রক্রিয়া এবং চেতনা।

বস্তু কাঠামো গঠন করে।

প্রক্রিয়া গতিকে টিকিয়ে রাখে।

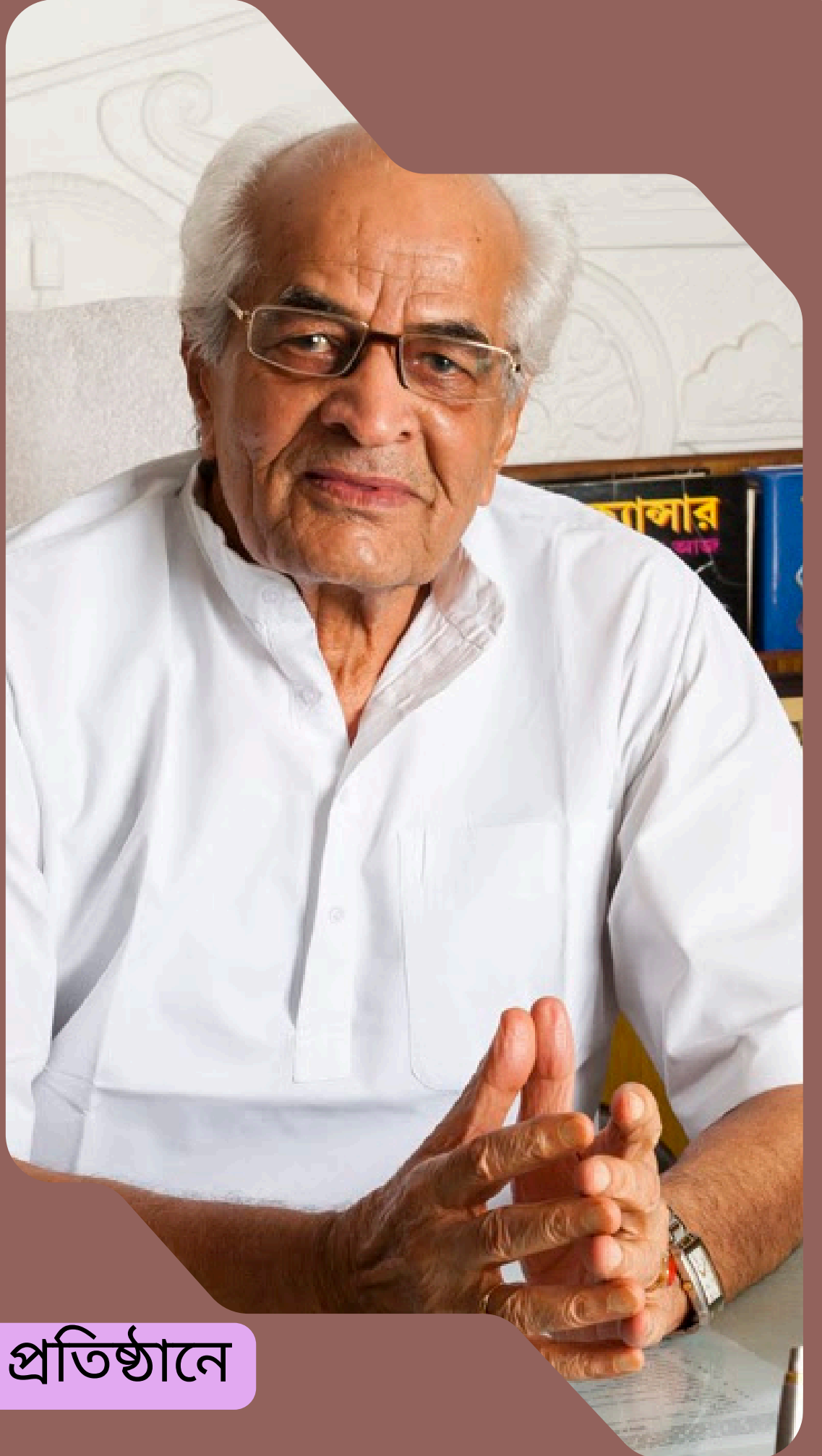
কিন্তু চেতনা দিকনির্দেশনা দেয়।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে চেতনা কেবল একটি দার্শনিক ধারণা নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় শক্তি যা জীবনের বিকাশকে প্রভাবিত করে।

এই উপলব্ধি থেকে, তাঁর ‘সচেতন রসায়ন’ (Conscious Chemistry) ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

“যেখানে রসায়ন চেতনার নির্দেশনায় চলে—সেটাই সচেতন রসায়ন।”





চিন্তা থেকে প্রতিষ্ঠানে

এই স্বপ্নকে বিমূর্ত থাকতে দেওয়া যেত না।

তার ছোট ভাইয়ের স্মরণে তিনি ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন।

শুরুটা ছিল সাদামাটা—কোনো উন্নত সরঞ্জাম বা বিশাল পরিকাঠামো ছিল না। ছিল শুধু একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং একটি দৃঢ় বিশ্বাস।

সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শান্তভাবে বলতেন:

“আগে দিকনির্দেশনা, পরে সম্পদ।”

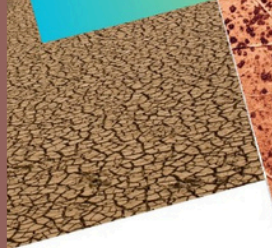
কেন্দ্রটি শুধু চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়নি, বরং স্বাস্থ্যকে বোঝার একটি ভিন্ন উপায় অন্বেষণের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল—এমন একটি উপায় যা শরীরের দুর্বলতার পরিবর্তে তার সক্ষমতার উপর আলোকপাত করে।



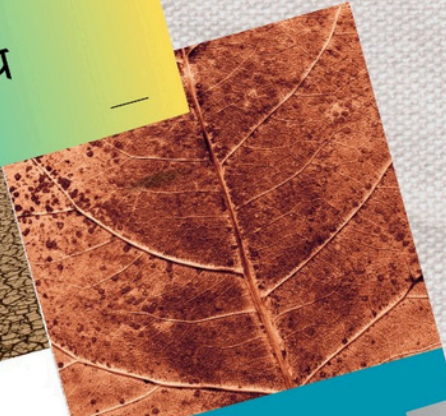


प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी
सबके साथ

PROFESSOR SHANKAR TRIVEDI
CREATIONS



शंकर त्रिवेदी
श्री धरती, सोंधी बांस

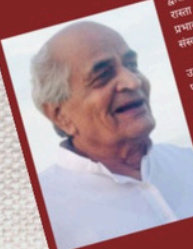


प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी
अवनीप महाकाव्य

कुंती कुंती कुंती
कुंती कुंती कुंती
कुंती एक माँ
शिवाशंकर त्रिवेदी
सृजन-चेतना प्रकाशन



संज्ञौती के दियो
शिवाशंकर त्रिवेदी



प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी एक वैदिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी थे। वे 'संज्ञौती' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक हैं।

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले परिकार में जन्मे प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी का जीवन संस्कृति में विशेष रुचि रखे रहने के साथ ही संस्कृति के एक अटूट

श्री शिवदेवी किसी भी धर्महीन ने मानव अर्थमय करके प्रतिबन्धन का प्रतीक जीवन और व स्वतंत्रता



प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी
युग-बोध

सर
या है



प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी
ता खण्ड काव्य

एक मन या चिन्तार मतोई गभीरभावे लिखत

তঁার কীর্তি শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

তা তঁার লেখার মাধ্যমেও সমানভাবে বেঁচে ছিল।

তিনি কেবল একজন গবেষকই ছিলেন না, বরং একজন চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন যিনি তত্ত্ব ও সূত্রের উর্ধ্বে জীবনকে বুঝতেন।

তঁার রচনা—'কুন্তি: আ মাদার', 'অবনীশ', এবং 'সুখি ধরতি সোনধি বাস'—মানুষের সংগ্রাম, আবেগ এবং অন্তরের যাত্রাকে প্রতিফলিত করে।

এগুলোর মধ্যে, 'সঞ্জোটি কে দিয়ে' বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী। এটি জীবনের সেই নীরব মুহূর্তগুলোকে ধারণ করে, যেখানে অন্ধকারের মাঝেও একজন মানুষ তার অন্তরের আলো খুঁজে পেতে শেখে।

তঁার বিশ্বাস ছিল সহজ:

অতীতকে পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু তা ভবিষ্যৎকে পথ দেখাতে পারে।





এক চলমান চিন্তা

২০১৫ সালের ২৬শে এপ্রিল, অধ্যাপক ত্রিবেদী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু তিনি কোনো শূন্যতা রেখে যাননি—তিনি রেখে গেছেন এক জীবন্ত চিন্তাধারা।

আজও, তাঁর ভাবনাগুলো ডি.এস. রিসার্চ সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে চলেছে—নীরবে, অথচ অর্থবহভাবে। তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি চিন্তাধারা:

গভীরভাবে প্রশ্ন করুন।

প্রকৃতিকে বুঝুন।

শরীরের ওপর আস্থা রাখুন।

তাঁর জীবন বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা, সাহিত্যিক গভীরতা এবং নিঃস্বার্থ সেবাকে একত্রিত করেছিল।

তিনি শুধু তাঁর সময়ের মানুষই ছিলেন না—তিনি ছিলেন সময়ের চেয়েও এগিয়ে। এক সত্যিকারের রেনেসাঁস মন—

যিনি চলে গেছেন, কিন্তু পৃথিবীকে দেওয়া তাঁর ভাবনাগুলো নিয়ে কাজ করা কখনও পুরোপুরি থামাননি।





“एकजन मानुष प्रकृतपम्के चले याय ना...
यदि से एमन एकटि चिन्ता रेखे याय या बेँचे
थाके।”